বাংলা
ও
বাঙালী

সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আজ সে শক্তিহীন, নেতৃহীন। আজ তাহার মনীষা নাই, ধর্ম নাই। অথচ একদিন তাহার বাহুবল সমগ্র উত্তর ভারত কুক্ষিগত করিয়া ভারত মহাসাগরেও আলোড়ন তুলিয়াছিল। একদিন তাহার মনীষা ও ধর্ম সমগ্র এশিয়াকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। সে-দিনের কথা স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীকে আজ সমর্থ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই এই বইখানি লেখা হইল।

সূচীপত্র

বাংলা ও বাঙ্গালী

বাঙ্গালীর দেশ

আমরা বাঙ্গালী : বাংলা দেশ বা বঙ্গদেশ আমাদের দেশ। কিন্তু বঙ্গদেশ বলিতে যে ভৌগোলিক সীমা আমরা আজ বুঝি পুরাতন কালে ঠিক তাহাই বুঝাইত না। আধুনিক বঙ্গদেশের ভৌগোলিক আবেষ্টনীর মধ্যে যে ভূভাগ সীমাবদ্ধ প্রাচীন কাল হইতে বহুকালাবধি ইহা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশের সহিত অপর অংশের প্রায়ই কোন ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকিত না। প্রত্যেক অংশের স্বকীয় নাম ছিল।

আমরা আধুনিক বঙ্গদেশের অংশ বিশেষকে বুঝাইতে প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগের যে সকল নাম পাই তাহার মধ্যে বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, উপবঙ্গ, রাঢ়, গৌড়, কর্ণসুবর্ণ, সমতট, ডবাক, হরিকেল, বঙ্গলম, বঙ্গাল, কিরাদই, গঙ্গারিডই, প-ন-কো-লা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত নামই কোন না কোন সময়ে বঙ্গ দেশের কোন না কোন অংশকে বুঝাইত। প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধশাস্ত্রে, চীনদেশীয় ও গ্রীসদেশীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং প্রাচীন লেখমালায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবেই ইহাদের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু নামগুলির সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইহা লইয়া বহু মতান্তর এবং মতান্তর সৃষ্টি হইয়াছে। এই

পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রত্নতত্ত্ববহুল আলোচনার মধ্যে প্রবেশ করা নিষ্ফল। জটিলতার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া যে সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে আমরা তাহাই শুধু আলোচনা করিব।

বঙ্গ, উপবঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গলম, বঙ্গালদেশ প্রভৃতি নাম সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গকেই অথবা পূর্ববঙ্গের অন্তর্বর্তী কোন ভূভাগকেই বুঝাইত। রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক কারণবশতঃ ইহাদের সীমা যুগে যুগে পরিবর্তিত হইত। এই কারণেই একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গ বলিতে কখনও আধুনিক পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশকে, কখনও সমগ্র পূর্ববঙ্গকে, আবার কখনও পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা বৃহত্তর ভূভাগকে বুঝাইত। মহাভারত, রঘুবংশ ও জৈন গ্রন্থাদি পাঠে স্পষ্টই মনে হয় "বঙ্গ" শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটি ব্যাপক এবং অপরটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে সময় সময় লৌহিত্যের পূর্ব হইতে কপিশা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকে বুঝাইত। সংকীর্ণ বঙ্গ, সমতট, সাগরাণূপ ও বঙ্গাল দেশ হইতেও পৃথক বলিয়া নির্দিষ্ট হইত।

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনোক্ত 'বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে' এবং কোন কোনও গ্রন্থের 'বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্বেণ' প্রভৃতি বাক্যে মনে হয় বিক্রমপুর ও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরস্থ ভূখণ্ডই এই সংকীর্ণ বঙ্গ। উত্তরকালে বঙ্গ 'সাগরাণূপ' পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বরাহ-মিহিরের 'বৃহৎ সংহিতায়' ষষ্ঠ শতাব্দীর কোনও সময় সমতট ও বঙ্গ পৃথক ছিল বলিয়া লিখিত আছে। অথচ মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে মধ্যম পাণ্ডব বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া পরে ব্রহ্মপুত্র নদী অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় ভীম যে 'বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ', সেই বঙ্গরাজের বঙ্গদেশ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমতীরে অবস্থিত ছিল।

পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ সমতট, বঙ্গলম, বঙ্গালদেশ এবং হরিকেলকে একই প্রদেশের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন কালে সমুদ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ববঙ্গই ঐ নামগুলির অভিধেয় ছিল। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই যে একটি সংকীর্ণ অর্থ ছিল তাহাও নিশ্চয়।

বরাহমিহির সমতট ও বঙ্গকে পৃথক প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কলচুর্যবংশীয় বিজ্জল দেবের অবলুর লিপিতে 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল' পৃথক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অভিধান চিন্তামণি প্রণেতা হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ'। বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে বঙ্গালদেশ নহে, পরন্তু একটি স্বতন্ত্র ভূভাগ তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। অতএব আবুল ফজল যদিও বঙ্গ এবং বঙ্গাল একই দেশের ভিন্ন নাম বলিয়া সূচনা করিয়াছেন তথাপি এই দুই নামে যে দুইটি ভিন্ন দেশ সূচিত হইত তাহা বলিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না। বঙ্গাল ভূমি ও বঙ্গালদেশ বলিতে হয়ত বর্তমান বাখরগঞ্জ, রংপুর এবং ব্রহ্মপুত্রের অন্তর্বর্তী ভূভাগকে বুঝাইত। কালক্রমে এই সমস্ত ভূভাগই বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। উপবঙ্গ দক্ষিণ ও মধ্য বাংলার দেশসমূহ অর্থাৎ যশোহর, খুলনা (সুন্দরবন সহ), চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলা-সমূহের ভাগ বা অংশবিশেষ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া মনে হয়। বঙ্গ হইতে পৃথক সমতট পূর্ববঙ্গের সাগর সংশ্লিষ্ট কোনও অংশকে বুঝাইত। বঙ্গদেশ হইতে অভিন্ন সমতট সমগ্র খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশবিশেষ সহ সমগ্র পূর্ববঙ্গকেই বুঝাইত। ডবাক বলিতে হয়ত ঢাকা জিলার কোনও অংশ নির্দিষ্ট ছিল।

আধুনিক উত্তর বঙ্গকেই পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র আখ্যা দেওয়া হইত। পৌণ্ড্রকে কেন্দ্র করিয়াই পরবর্তীকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি সৃষ্টি হইয়াছিল। গৌড় এবং বরেন্দ্র বলিতেও উভয় বঙ্গকেই বুঝাইত। পৌণ্ড্র রাজ্যের সীমা প্রাচীনকালে পশ্চিমে কৌশিকী হইতে পূর্বদিকে করতোয়া এবং উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে গঙ্গাপ্রবাহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। অনুমান হয় মালদহ জিলার উত্তর ও পূর্ব অংশ, দিনাজপুর ও রংপুরের দক্ষিণাংশ এবং রাজসাহী ও বগুড়া জিলা লইয়া প্রাচীন পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র রাজ্য সংগঠিত হইয়াছিল। গৌড়ের সীমা গৌড়াধিপতির ক্ষমতানুযায়ী কখনও বৃহৎ এবং কখনও ক্ষুদ্র হইত। মোটের উপর পৌণ্ড্র, গৌড় ও বরেন্দ্র বলিতে সাধারণতঃ উত্তরবঙ্গের সুবৃহৎ অংশ বুঝাইত, ইহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কোথাও কোথাও গৌড়দিগকে সমুদ্রাশ্রয় বলা হইয়াছে। অনুমান হয়, গৌড় বলিতে কখনও কখনও রাজনৈতিকভাবে সমগ্র বাংলাদেশকেও বুঝাইত।

'লাড়বট্ট' 'রাড়রাষ্ট্র' বা রাঢ় দেশেরই নামান্তর মাত্র। ইহা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন নাম। কোনও কোনও সময় রাঢ় প্রদেশ উত্তর রাঢ় এবং দক্ষিণ রাঢ় এই দুই রাজ্যে বিভক্ত ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণসুবর্ণ এই রাঢ়েরই রাজধানী ছিল। রাজ্য এবং রাজধানী এই দুই অর্থেই কর্ণসুবর্ণ নাম ব্যবহৃত হইত।

গ্রীস দেশীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গ বা উল্লিখিত কোন রাজ্যের বা দেশের নাম নাই। বাংলার অদ্যাপি অনির্দিষ্ট কোনও ভূভাগকে বুঝাইবার জন্য গ্রীক ভ্রমণকারিগণ 'কিরাদিয়া' এবং 'গঙ্গারিডয়' বা 'গঙ্গারিডি' নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণের অনেকে

কিরাদিয়াকে ত্রিপুর রাজা বলিয়া মনে করেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের পূর্ব সীমায় গঙ্গারিডয় রাজ্য অবস্থিত ছিল। অনেকেই অনুমান করেন রাঢ়, পুণ্ড্র এবং বঙ্গ গঙ্গারিডয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূভাগ বিশেষ।

এই সীমা নির্দেশ ও অবস্থান নির্ণয়ের জটিল বাকবিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া আমরা সাধারণভাবে দেখিতে পাই যে, আধুনিক বাংলা দেশ প্রাচীনকালে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ভাগেরই বিভিন্ন নাম ছিল। কোনও না কোনও সময়ে প্রত্যেক ভাগেরই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্ত্বা ছিল। রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দেশ ক্রমশঃ রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক ঐক্যের দিকে অগ্রসর হইয়া বর্তমান বাংলা প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বঙ্গ ও বাংলা একীকৃত হয় নাই, রাঢ় ও বরেন্দ্র স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকগণ বঙ্গশব্দ সংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। এই সময়ের বঙ্গদেশকে লক্ষ্মণাবতী হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু রাঢ় ও বরেন্দ্র তখন লক্ষ্মণাবতী তথা গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। খুব সম্ভব ১৩২০ খৃঃ অব্দে তুঘলক সাহের রাজত্বকালে লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম অর্থাৎ উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গের অধিকাংশ স্থান মিলিত হইয়া অখণ্ড বাংলা দেশ গঠিত হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায়। বঙ্গাধিপতি পাল রাজগণ এবং 'প্রোঢ়া রাঢ়ার' অধীশ্বর সেন নৃপতিবৃন্দ রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভাবী মিলনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর বহু শতাব্দীর চেষ্টায়, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে একীভূত এই বাংলাদেশ আজ মুহূর্তের বিড়ম্বনায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

আসাম-ব্রহ্মদেশ-বঙ্গোপসাগর-উড়িষ্যা-বিহার-ও-হিমালয় পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম গৌড় বা রাঢ়দেশ না হইয়া বাংলাদেশ কেন হইল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসুর মনে স্বভাবতঃই জাগিতে পারে। অনুশাসনলিখিত বঙ্গালম বা বঙ্গালদেশ হইতেই আধুনিক বঙ্গপ্রদেশ-জ্ঞাপক 'বাংলা' নামের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আরব-এবং-পারস্যবাসী বণিকগণের পূর্বসাগরীয় বাণিজ্যতরীগুলি মসলিন ও মসলা প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের সহিত বঙ্গলম নামটিও স্বদেশে লইয়া গিয়াছিল। পরে তাহারা ভাষার প্রকৃতিবশতঃ বঙ্গলমকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া পুনরায় বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। এই পার্শী 'বাংলা' ক্রমে ক্রমে ভারতীয় নবাব বাদশাহদের নিকট সমগ্র আধুনিক বঙ্গদেশের অভিধেয় হইয়া উঠিয়াছিল। আবুলফজল আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেও লিখিয়াছেন—"নামি আসলি বাংলা বঙ্গ" অর্থাৎ বাংলার প্রকৃত নাম বঙ্গ। বাংলা নামের ইহাই বোধহয় প্রথম উল্লেখ।

এই প্রসঙ্গে একটি তথ্য খুব কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়; ভারতের পূর্ব-সাগরীয় উপকূলে Bengala নাম্নী একটি নগরীর অস্তিত্ব আধুনিক ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর নৌবল

মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস বঙ্গদেশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতান্ নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু-চ।

সমরকৌশলী হিসাবে তৎকালীন বঙ্গদেশবাসীদের যে বৈশিষ্ট্য ছিল এই শ্লোকে মহাকবি অবশ্যই সেই বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ

করিয়াছেন। সেই যুগের বাঙ্গালীরা আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই নৌ-বাহিনী প্রস্তুত রাখিত। বাংলার,—বিশেষতঃ বাংলার যে অংশ পূর্ব-প্রান্তবর্তী তাহার—কোমল নিম্নভূমির উপর দিয়া গঙ্গা ও ভাগীরথী চতুর্দিকে বহু বাহু বিস্তার করিয়া সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইত; আর বাংলার ক্ষুদ্রবৃহৎ নৌ-বহর বিভিন্ন রকমের যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত হইয়া নৌ-সাধনোদ্যত বাঙ্গালী সৈন্যের বিজয়পতাকা উড়াইয়া দিয়া সগৌরবে ভাসিয়া বেড়াইত। রঘু যখন দেশের পর দেশ এবং রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া ভাগীরথীর তীরে তীরে বঙ্গদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল ক্ষুদ্র বাংলার তৎকালীন নরপতির নৌবাহিনী তখন এতটা শক্তিশালী ছিল বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে যে, রঘুর সর্বগ্রাসী বিজয় বাহিনীর সম্মুখীন হইতে তাহা ইতস্ততঃ করে নাই। রঘুর ঐতিহাসিকতা প্রমাণ হয় নাই; সুতরাং বাঙ্গালীর এই নৌ-সাধনা কত যুগের তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তবে এই কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে বাঙ্গালীর নৌবাহিনীর এবং নৌযুদ্ধ-তৎপরতার কথা কিংবদন্তীর মত দেশে দেশে প্রচারিত হইয়া সুদূর উজ্জয়িনীর কবিকুটীর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

অতীত অনৈতিহাসিক যুগের অপর একটি কাহিনী প্রাচীন বাংলার বিপুল সামুদ্রিক শক্তির উদাহরণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। লাড়বট্ট নামক রাষ্ট্রের অধিপতি সিংহবাহু সাতশত অনুচর এবং আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র ও আহার্য দ্রব্যাদি সহ তাঁহার পুত্র বিজয়সিংহকে সমুদ্রপথে অর্ণবপোতে নির্বাসিত করেন। আধুনিক যুগের দুই একজন দুঃসাহসী বাঙ্গালীর মত এই নির্বাসিত বিজয়সিংহ তাহার অনুচরদের লইয়া সমুদ্রের বুকে তরী ভাসাইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস যেমন জেনোয়া বন্দরের উপলখণ্ডে বসিয়া স্বপ্নাবিষ্ট চক্ষে নীল

সমুদ্রের সুদূর দিগন্তে নূতন পৃথিবীর কল্পনা করিতেন, বাঙ্গালী বিজয়সিংহও সেইরূপ তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমুদ্রসৈকতে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর বসিয়া সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের স্বপ্ন দেখিত। কতদিন, কতমাস ও কত বৎসর বসিয়া সে তাহার অনুচরদিগকে নৌযুদ্ধে নিপুণ করিয়া তুলিয়াছিল! রাজ্যহারা রাজপুত্র অকূল সমুদ্রে পাড়ি জমাইল। সম্মুখে অসীম উত্তালতরঙ্গবিক্ষুব্ধ নীল জলরাশি। পশ্চাতে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নির্বাসনের কলঙ্ক। ঊর্ধ্বে,—চতুর্দিকে ঝঞ্ঝার উদ্দাম তাণ্ডব। ইহারই মধ্যে বাঙ্গালী নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর ভাসিয়া চলিল। বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব-সংকুল প্রতীক্ষার পর একদিন অর্ধধূসর ঊষার আলোকে বাঙ্গালীর নৌবহর লঙ্কাদ্বীপের তটপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর লঙ্কার গিরিসংকুল পথে পথে বাঙ্গালীর বিজয় অভিযান অগ্রসর হইয়া চলিল। অমিতাভ বুদ্ধদেবের নির্বাণ প্রাপ্তির শোকাচ্ছন্ন গাম্ভীর্য তখনও বাংলা ও বিহারের আকাশ হইতে অপনীত হয় নাই। এমনই এক দিনে বাংলার নির্বাসিত সন্তানেরা লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করিল। সে হইল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের কথা। সিংহলের 'মহাবংশে' বিজয়সিংহের বিজয়যাত্রা অমর হইয়া রহিয়াছে। 'জাতক' ও 'রাজাবলী' এই কাহিনীকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সেইদিনও দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময়।

কবি সত্যেন্দ্রনাথও এই কাহিনী স্মরণ করিয়াই গাহিয়া গিয়াছেন :

আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে তার শৌর্যের পরিচয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বাংলার সন্নিহিত সমুদ্রপ্রদেশে বাংলার শাসনকর্তাদের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। কতিপয় তাম্রশাসনে আমরা তাহার পরিচয় পাই। ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফরিদপুরের উত্তরদিকে কোনও সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে অর্ণবপোত নির্মাণের সুবৃহৎ পোতস্থান ছিল এবং সমুদ্রযাত্রী জাহাজগুলির শাসন ও সংরক্ষণের জন্য একজন রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। মনে হয় পূর্ব সমুদ্র এই সময়ে বঙ্গাধিপের প্রভুত্বান্তর্গত ছিল এবং সমুদ্রপথে যে সমস্ত পণ্যবাহী পোত যাতায়াত করিত বঙ্গাধিপের শুল্কাধ্যক্ষ তৎসমুদয়ের শুল্ক আদায় করিত। বহিঃসমুদ্রের বাণিজ্যব্যাপার তাহার আদেশ ও ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত হইত। বহিঃসমুদ্রের উপর সামরিক প্রভাব থাকিলেই মাত্র ইহা সম্ভব, এবং বঙ্গসাগর ও ভারত মহাসাগরের উপর বঙ্গাধিপের অপরিসীম সামরিক প্রভাব ছিল বলিয়াই মনে হয়। সমুদ্রতীরে যে সকল পোতাশ্রয়, বন্দর এবং বাজার ছিল সেইগুলিকে জলদস্যুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রবল নৌবহরের প্রয়োজন। বঙ্গদেশে প্রাচীনকাল হইতেই যেরূপ অসংখ্য সমৃদ্ধিশালী পোতাশ্রয় ও সমুদ্র-বন্দর ছিল তাহাতে মনে হয় বঙ্গাধিপের নৌবহরও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ষষ্ঠ শতকের তাম্রশাসনাদি আলোচনার পর F. E. Pargiter সাহেব বাংলার তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—And it would no doubt have been expected to look after harbours and marts in order to maintain trade and probably to exercise some kind of maritime jurisdiction.

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাল বংশীয় ও সেন বংশীয় নরপতিগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে উক্ত নৃপতিগণের অনেক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শাসন-পত্রে দেখা যায় যে, বঙ্গাধিপ ধর্মপালদেব ও মদন-পালদেব নিয়ত ভাগীরথীবক্ষে রণতরীসমূহ সজ্জিত রাখিতেন। পাশ্চাত্ত্য ভারতের দিগ্বিজয়ী রাজন্যবর্গ যখন দেখিতেন ঘনসন্নিবিষ্ট পর্ব্বতশিখরশ্রেণীর মত সজ্জিত রণতরীসমূহ ভাগীরথীর জলরাশির উপর নিয়ত পরিচালিত হইয়া বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতেছে তখন হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি সমেত বিপুল স্থলবাহিনী লইয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশকে আক্রমণ করিতে বহুবার ইতস্ততঃ কবিতেন। "ভাগীরথী-প্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌকটক-সম্পাদিভ-সেতুবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখরশ্রেণী-বিভ্রমাৎ" প্রতিহার-গুর্জ্জর-রাজগণের বিজয়যাত্রা সহসা স্তম্ভিত এবং অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। ধর্মপালদেবের পাটলীপুত্র নগর রণতরী-সমূহদ্বারা সুবেষ্টিত থাকিত। মদনপালদেবের রামাবতী নগরীও নৌকটক-পরিবৃত ছিল। পাল বংশের পঞ্চদশ নরপতি কুমারপাল-দেবের সেনাপতি বৈদ্যদেব দক্ষিণ বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। অসংখ্য গজারোহীসৈন্য-সমভিব্যাহারে বৈদ্যদেব যখন দক্ষিণ বঙ্গের দিকে অগ্রসর হন তাঁহার রণদুর্মদ গজসমূহ তখন দক্ষিণ বঙ্গের রণতরী-সমূহের বিকট রণনিনাদে ত্রস্ত হইয়া বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। পাল বংশের বিভিন্ন তাম্রশাসনে 'নৌকাধ্যক্ষ' ও 'নৌবলব্যাপৃতক' প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। সেনবংশের একাধিক তাম্রশাসনে নৌবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কথা উল্লিখিত আছে। মোটের উপর পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ যে নৌবলে বিশেষ বলীয়ান ছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং বঙ্গাধিপগণের

রণতরী-সমূহ শুধু ভাগীরথী-বক্ষেই বিচরণ করিত না; বঙ্গসাগরের তরঙ্গ-সংকুল সুনীল জলরাশির উপরও তাহাদের নিরন্তর যাতায়াত ছিল।

বাঙ্গালীর স্বাধীনতা

আমরা দেখিয়াছি মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় মহাকবি কালিদাস কি ভাবে বাংলার নৌ-সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনায় শুধু বাংলার অধিপতিদের নৌশক্তির প্রমাণই আমরা পাই না। শ্যামল, কোমল মৃত্তিকার রসে পরিপুষ্ট মৌসুমীবায়ুর আর্দ্র আপ্যায়নে সুগঠিত-দেহ স্নেহপ্রেম-বিগলিত বাঙ্গালীরা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আবহমানকাল যে আত্মাহুতি দান করিয়াছে সেই ইতিহাসেরও গৌরবময় প্রথম অধ্যায় এই বর্ণনায় নিহিত রহিয়াছে।

দিগ্বিজয়ী সিকন্দর শাহ যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলি একের পর এক পদানত করিয়া পূর্ব-ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করিতেছিলেন তখন 'গঙ্গারিড়ই' ও 'প্রাশী' নামক দুই জাতি বা রাষ্ট্র বিদেশীর আক্রমণ হইতে জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিপুল সৈন্য-বাহিনী সমবেত করিয়াছিল। এই দুই জাতি কাহারা—গ্রীক ইতিহাসে তাহার কোন ইঙ্গিত নাই। কিন্তু ইহা মনে করা খুব অসঙ্গত হইবে না যে, গঙ্গারিড়ই বা প্রাশী বলিতে নিশ্চয়ই শুধু দুর্বল ধ্বংসোন্মুখ নন্দরাজ্যকেই বুঝায় নাই। গ্রীক আক্রমণের অনতিকালপরবর্তী যুগের যে ইতিহাস আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে মনে হইতে পারে যে বঙ্গদেশের অংশবিশেষ মৌর্য যুগেও উল্লেখযোগ্য এবং লোভনীয় রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। ইহা অসম্ভব নহে যে এই রাজ্যই সিকন্দর

শাহের সর্বভুক আক্রমণ হইতে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গঙ্গা নদীর তীরবর্তী প্রদেশে সৈন্যসজ্জা করিয়াছিল। লোকমুখে এই বিপুল সৈন্যসমাবেশের কথা শুনিয়া বিশ্ববিজয়ী গ্রীকবীর আর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করেন নাই।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পর খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস অন্ধকারময়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা বাংলাদেশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাষ্ট্র দেখিতে পাই এই সময়ই বোধ হয় তাহার আরম্ভ। উত্তর বঙ্গের কোন কোন ভূভাগ এই সময়ে হয়ত মৌর্য এবং কুশান রাজাদের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু বাংলার অন্যান্য অংশের নরপতিগণ শক্তিশালী মৌর্য-সুঙ্গ-কান্ব-কুশানবংশের দিগ্বিজয়ীগণের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বাঙ্গালীর এই স্বাধীনতার সঙ্কটময় মুহূর্ত উপস্থিত হইয়াছিল চতুর্থ শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের আক্রমণে। দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনীর নিকট একে একে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্য ও জনপদ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্তী সমতট ও ডবাক পর্যন্ত তিনি তাঁহার দিগ্বিজয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি-রচয়িতা কবি বাঙ্গালীর সেই দিনকার স্বাধীনতাযুদ্ধের কোন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু সুদূর উজ্জয়িনীর কুটীরপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত কি ভাবে সেইদিনকার বাঙ্গালীর বীরত্ব এবং যুদ্ধকাহিনী কিংবদন্তীর মত প্রচারলাভ করিয়াছিল মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশে আমরা তাহার প্রমাণ পাইতে পারি।

গুপ্ত সম্রাটের দিগ্বিজয় কালে কালিদাস হয়ত বালক মাত্র। উজ্জয়িনীর কুটীর-চত্বরে বসিয়া হয়ত তিনি দিগ্বিজয়-কাহিনী শুনিয়া

থাকিবেন। অথবা যৌবনের প্রারম্ভে এই কাহিনী হয়ত গ্রাম্য কবিদের স্তুতিগানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল। তাই রঘুর দিগ্বিজয়-যাত্রা বর্ণনা করিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে তিনি সমুদ্রগুপ্তেরই দিগ্বিজয় কাহিনী অনুপম কবিকুশল হস্তে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী রঘুর দিগ্বিজয়কে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে আমরা জানিতে পারি, আজ হইতে দেড় হাজারেরও অধিক বৎসর পূর্বে বাঙ্গালী জনসাধারণের মনে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি বিপুল উৎসাহ ও উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছিল। অপরাজেয় বাহিনীর পরিচালক বলিয়া সমগ্র ভারতে সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মগধের পশ্চিম পার্শ্বস্থ শক্তিশালী রাজ্যগুলি তাঁহার পদানত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারত তাঁহার দুর্দাম শক্তি অনুভব করিয়াছে। এই দিগ্বিজয়ী সম্রাট যখন তাঁহার সমগ্র বাহিনী লইয়া পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল যে, অতি ক্ষুদ্র প্রাচ্য-রাজ্যগুলির অন্ততঃ একটিও তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবে? আমাদের এই বঙ্গদেশ তাহা করিয়াছিল। সুহ্মদেশের রাজা বেতসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। উৎকলেশ্বর তক্ষশিলাধিপতি অম্ভীর মত শুধু যে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল তাহাই নহে, পরন্তু সমুদ্রগুপ্তকে কলিঙ্গ দেশে যাইবার সহজ ও সুগম পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আমাদের বাংলার রাজন্যগণ অনেকেই দিগ্বিজয়ীর দম্ভের নিকট মেষের মত নতিস্বীকার করা অপেক্ষা বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আত্মবিসর্জ্জন শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিল। ক্ষুদ্র বাংলার ক্ষুদ্র নৌশক্তি সেদিন উত্তর ভারতের সার্বভৌম সম্রাট

সমুদ্রগুপ্তকে অন্ততঃ এইটুকু বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণা যাহাদের থাকে, দেশকে যাহারা প্রাণাধিক প্রিয় মনে করে, তাহারা যত ক্ষুদ্রই হউক, যত নগণ্যই হউক, তাহাদের শত্রু যত বড় প্রতাপশালী সেনাপতিই হউক, যুদ্ধে তাহাদের জয়ই হউক আর পরাজয়ই হউক, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহারা শেষ রক্তবিন্দু দান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কালিদাসের বর্ণনার মধ্যে ইতিহাস না থাকিতে পারে, রঘুর দিগ্বিজয়ের সহিতও সমুদ্রগুপ্তের কোন সংস্রব না থাকিতে পারে, কিন্তু যে কথায় কোন সংশয় নাই তাহা হইতেছে এই যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে উজ্জয়িনী এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ জানিত যে, ভারতের পূর্বপ্রান্তে বঙ্গদেশ নামে এমন একটি প্রত্যন্তদেশ রহিয়াছে যাহার রাজা অথবা প্রজা কেহই পার্শ্ববর্তী অন্যান্য বৃহৎ রাজ্যের মত বিনাযুদ্ধে স্বাধীনতা বিসর্জন দেওয়ার মত দুর্বল মনোবৃত্তি পোষণ করে না।

স্বাধীনতার এই যুদ্ধে বাঙ্গালীরা পরাজিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পরাজয়ের গ্লানি তাহারা দীর্ঘদিন সহ্য করে নাই। কয়েক বৎসর পরই বাংলার শাসনকর্তারা আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। পাটলীপুত্র বা উজ্জয়িনীর সিংহাসন হইতে স্বাধীনতাপ্রিয় বাঙ্গালীর প্রণতি গ্রহণ করা মগধাধিপতির পক্ষে বেশীদিন সম্ভব হইল না। বঙ্গীয় বীরদিগকে দমন করিবার জন্য সমুদ্রগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে আবার সমুদ্রাশ্রয় প্রত্যন্ত প্রদেশে সৈন্য সমাবেশ করিতে হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির রেশ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই দিল্লীতে লৌহস্তম্ভ প্রোথিত করিয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তকে ঘোষণা করিতে হইয়াছিল,—আমি বাঙ্গালীকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিলাম।

গুপ্তগণ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি অর্থাৎ বঙ্গের কিয়দংশ ব্যতীত বঙ্গের অন্য কোন অংশ শাসনাধীনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমনকি পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তিও গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার পূর্ব হইতেই কার্য্যতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির শাসনকর্ত্তারা অনেকে "মহারাজাধিরাজ পৃথিবীপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বহু স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণের বিক্রমসূর্য অস্তমিত হইবার একশত বৎসরের মধ্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানে আমরা ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচার দেব, জয়নাগ প্রভৃতি স্বাধীন নরপতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাই।

ইহার কিছুকাল পরে কর্ণসুবর্ণে অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে শশাঙ্ক নামক একজন সামন্ত নৃপতির উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই। ইতিহাসে ইহার প্রথম পরিচয় শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেব নামে। ক্রমশঃ তিনি রাঢ়, গৌড় ও মগধ হইতে বিদেশী শাসকদিগকে বিতাড়িত করিয়া শুধু যে বঙ্গদেশকেই স্বাধীন করিয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু পশ্চিম ভারতের উপরও লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় নামে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাংলার এই সুবিস্তীর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র অধিকদিন স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবার জন্য গৌড়েশ্বর মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্রাদিত্যকে দুই সুবৃহৎ রাজ্যের শক্তিশালী অধিপতির সঙ্গে আজীবন কঠিন যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পশ্চিম দিকে সকলোত্তরাপথনাথ কনৌজাধিপতি হর্ষবর্ধন এবং পূর্বদিকে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মা--যুগপৎ বাংলার স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক সর্বদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া আজীবন এই দুই প্রবল শক্তিকে দুই হাতে ফিরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশ আবার সাময়িকভাবে বিদেশীর করায়ত্ত হইল। মহারাজ শশাঙ্ক বোধ হয় দক্ষিণে গঞ্জম প্রদেশে মৃত্যু পর্যন্ত স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে পরিহাস করিবার জন্যই বোধ হয় নিজেকে 'চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি-পত্তনবতী' বসুন্ধরার সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।

শশাঙ্কের পর বঙ্গদেশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সমীপবর্তী রাজারা মুহুর্মুহুঃ বহুধাবিভক্ত বাংলার ধনমান ও স্বাধীনতা হরণ করিতে লাগিল। ইতিহাসে এই যুগের নাম মাৎস্যন্যায়ের যুগ। এই মাৎস্যন্যায় যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করিল তখন বাংলার প্রজাপুঞ্জ সমবেত হইয়া গোপালদেব নামক একজন সর্বগুণান্বিত পুরুষকে বাংলার রাজা নির্বাচিত করিলেন। বাংলার প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় গোপালদেব পরস্বাপহারীদের হস্ত হইতে বাংলার স্বাধীনতা উদ্ধার করিলেন। অতঃপর বাংলার ইতিহাসে যে যুগ আরম্ভ হইল তাহা আর স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস নহে; ইহাকে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য বিজয়ের যুগ বলা যাইতে পারে।

বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য

শশাঙ্ক শুধু বাংলার স্বাধীনতাযজ্ঞের অন্যতম নায়ক হিসাবেই প্রসিদ্ধ নহেন ; বাংলার যে অল্পসংখ্যক রাজা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী-সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যম করিয়াছিলেন শশাঙ্ক তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। তিনি গুপ্ত সম্রাট্‌দেরই এক শাখার বংশধর। সুতরাং বিলুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। বঙ্গের বৃহত্তম অংশ, মগধ এবং কলিঙ্গের একাংশ জয় করিয়া তাঁহার রাজ্যস্পৃহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। উত্তর ভারতে তখন তিনটি রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। একটি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি রাজা। অপরটি কনৌজের মৌখরী রাজা। তৃতীয়টি কামরূপের বর্মণ রাজা। সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে এই তিন রাজ্যের সহিত শশাঙ্কের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিল।

এই সময়ে মালবে গুপ্ত বংশীয় এক ক্ষুদ্র রাজা রাজত্ব করিতেন। পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা রাজ্যবর্ধন এবং তাঁহার ভগিনীপতি মৌখরী বংশীয় রাজা গ্রহবর্মার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য শশাঙ্ক মালবের এই গুপ্ত রাজার সহিত মিত্রতা করিলেন। মালবরাজ কনৌজ আক্রমণ করিয়া ভাস্করবর্মাকে নিহত করিলে রাজ্যবর্ধন মালবরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে মালবরাজ নিহত হন। রাজ্যবর্ধন যখন বিজয়গর্বে থানেশ্বরের দিকে ফিরিতেছিলেন তখন 'দুষ্ট-গৌড়-ভুজঙ্গ' মহারাজ শশাঙ্ক পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। থানেশ্বর এবং কনৌজ,—উত্তর ভারতের এই দুই শক্তিশালী রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হইয়া পড়িল। গৌড়কে কেন্দ্র করিয়া শশাঙ্ক যে দ্বিতীয় গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা

উপস্থিত হইল। কিন্তু থানেশ্বর এবং কনৌজের সৈন্য ও সেনাপতিগণ অল্পকালের জন্য বিরত ও বিমূঢ় হইয়া পড়িলেও অনতিবিলম্বে তাহারা এমন এক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিল যাহাতে শশাঙ্কের স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। নরপতিবিহীন দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের প্রজাপুঞ্জ সম্মিলিত হইয়া রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা শিলাদিত্য হর্ষবর্ধনকে কনৌজ এবং থানেশ্বর এই উভয় সিংহাসনে অভিষিক্ত করিল। হর্ষবর্ধন এই মিলিত শক্তির সার্বভৌম কর্তৃত্ব লাভ করিয়া গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। তিনি বুদ্ধিমান এবং রাজনীতিকুশল ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্র হইতে গৌড়েশ্বরের প্রভাব লুপ্ত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইলেও সুদূর কনৌজ হইতে গৌড় পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করিয়া গৌড়েশ্বরের ক্ষমতা চূর্ণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাই তিনি গৌড়েশ্বরের প্রতিবেশী কামরূপাধিপতি ঈশানবর্মার বন্ধুত্ব কামনা করিলেন। পূর্ব ও পশ্চিমের এই দুই শক্তি শশাঙ্ককে বাংলা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম চেষ্টা শশাঙ্কের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া গেল। শশাঙ্ক যে স্বপ্ন লইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন, দুইশত বৎসর পরে পালবংশীয় ধর্মপালদেবের শাসন সময়ে বাঙ্গালীর সেই স্বপ্ন সফল হইয়াছিল।

এই দুইশত বৎসরের মধ্যে বাংলার বাহুবল কাশ্মীরের দ্বারদেশ পর্যন্ত অনুভূত হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কাশ্মীরে এই সময় 'গৌড়-রাক্ষস-বিপ্লব' হইয়াছিল বলিয়া কাশ্মীরী কবি কহ্লন তাঁহার 'রাজতরঙ্গিণী'তে এক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয়দিগকে রাক্ষস বলিলেও কহ্লন সহস্রমুখে তাহাদিগের বীরত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা কাশ্মীরে যে শৌর্য প্রদর্শন করিয়াছিল

তাহা 'বিধাতুরপ্যশক্যম্'। কাহার সময়ে কেন এবং কে এই কাশ্মীরাভিযান পরিচালনা করিয়াছিল সে-সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই না। কহ্লনের গৌড়দেশ আমাদের গৌড়বঙ্গ নাও হইতে পারে। সুতরাং এই অভিযানের ঐতিহাসিকতা অনেকেই স্বীকার করেন না।

কিন্তু পালবংশীয় ধর্মপালদেব যে সুবিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিকতায় কাহারও সন্দেহ নাই। নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধর্মপালদেব গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পূর্ববঙ্গ সমেত সমস্ত বাংলাদেশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। অতঃপর মগধ জয় করিয়া তিনি পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর ভারত বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধমদমত্ত বাঙ্গালী সৈন্যের পরাক্রান্ত বাহুর নিকট রাজ্যের পর রাজ্য পরাজয় স্বীকার করিল। অবশেষে ধর্মপালদেব জয়োন্মত্ত সৈন্যবাহিনী লইয়া কনৌজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ধন-মান-যশঃ ও সমৃদ্ধিতে কনৌজ তখন উত্তর ভারতের সর্বপ্রধান নগর। কনৌজ অধিকার করাই উত্তর ভারতের সার্বভৌমত্ব লাভের প্রতীক স্বরূপ ছিল।

কনৌজ তখন রাজপুতানার গুজ্জর-রাজগণের প্রভাবাধীন। গুজ্জর রাজ নাগভট্টও গৌড়াধিপ ধর্মপালদেবের মত উত্তর ভারতের সম্রাট্ পদবী লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিত। তাহারই আশ্রিত ইন্দ্রায়ুধ নামক জনৈক সামন্তরাজ তখন কনৌজ শাসন করিত। ধর্মপালদেব ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করিলেন। তাঁহার আজ্ঞাবহ চক্রায়ুধকে তিনি তাঁহার সামন্তরূপে কনৌজের সিংহাসনে বসাইলেন। এই আকস্মিক রাজনৈতিক পরিবর্তনে গুজ্জররাজের সাম্রাজ্যস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি সমগ্র গুজ্জর বাহিনী সঙ্গে লইয়া ধর্মপাল ও তাঁহার আশ্রিত চক্রায়ুধকে শাস্তি

দিবার জন্য উত্তর দিকে অগ্রসর হইলেন। সৌরাষ্ট্রাধিপতি বাহুকধবল গুর্জর রাজের সামন্ত নরপতি ছিলেন। নাগভট্ট এবং বাহুকধবলের সম্মিলিত আক্রমণের সম্মুখে ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ অবশ্য বিশেষ রোধ করিলেন। স্বয়ং তাঁহারা পরাজিত হইয়া কনৌজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট সম্রাট। রাজপুতানার গুর্জরদের সহিত তাঁহার বংশপরম্পরাগত বিবাদ। উত্তরাপথে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে গুর্জরদের সহিত দ্বন্দ্ব অপরিহার্য বুঝিয়াই ধর্মপালদেব গুর্জর-অরাতি রাষ্ট্রকূটদের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। গুর্জরদের হাতে জামাতৃস্থানীয় ধর্মপালদেবের ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ শুনিয়া গোবিন্দ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণ-ভারত হইতে কনৌজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাগভট্ট পরাজিত হইয়া মরুপ্রান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ রাষ্ট্রকূট সম্রাটকে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ যখন দক্ষিণ ভারতে ফিরিয়া গেলেন ধর্মপালদেব তখন সমগ্র উত্তর ভারতের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত কোন নরপতি আর উত্তর ভারতে রহিল না। এইরূপে ধর্মপালদেবের বীর্য ও বিচক্ষণতার প্রভাবে প্রথম গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। মহারাজ শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী শিলাদিত্য হর্ষবর্ধন সম্রাট নামের যোগ্য ছিলেন কিনা এবং তাঁহার 'সকলোত্তর-পথ-নাথ' বিশেষণ স্তাবকতা মাত্র ছিল কিনা সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক-দের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কিন্তু গৌড়ীয় সিংহাসনে শশাঙ্কের উত্তরাধিকারী ধর্মপালদেব যে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বিন্ধ্য পর্যন্ত এবং গুজরাট হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথের সম্রাট

হইয়াছিলেন ইহা অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্তী সম্রাট দেবপালদেব পিতৃ-সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। উপরন্তু তিনি পূর্বদিকে আসাম এবং দক্ষিণে [illegible] জা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

দেবপালদেবের মৃত্যুর পরবর্তী তিনশত বৎসরের মধ্যে পাল সাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। শুধু গৌড়বঙ্গেই আমরা একাধিক স্বাধীন রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে সম্মিলিত করিয়া বাঙ্গালার রাজধানী হইতে আর একবার এক সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। সেন বংশীয় বিজয়সেন একাদশ শতাব্দীতে এই উদ্যোগের নায়ক হইয়াছিলেন। বর্মা রাজগণের দুর্বল হস্ত হইতে রাঢ় ও বঙ্গ অধিকার করিয়া বিজয়সেন বরেন্দ্র ও মগধ অধিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গদেশ ও মগধ তিনি এক রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি কলিঙ্গের কোনও একস্থানে কলিঙ্গাধিপতি অনন্তদেব চোড়গঙ্গকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অতঃপর বিজয়সেন পশ্চিমভারত-বিজয়ে অগ্রসর হইলেন। গঙ্গা-প্রবাহ পথে বিজয়সেনের নৌবাহিনী উত্তর ভারতে অগ্রসর হইল। সমগ্র অনুগঙ্গ প্রদেশ জয় করিবার জন্য নৌবিতান প্রেরিত হইল। এই দিগ্বিজয় যাত্রার ফল কি হইয়াছিল তাহা অবগত হওয়া যায় না। প্রশস্তিকারের সাক্ষ্যানুযায়ী বিজয়সেনের এই বঙ্গীয় নৌবহর গঙ্গার বীচিমালা আলোড়িত করিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল কিনা তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত না হইলেও বাংলার নৌ-বাহিনী যে বিজয়গর্বে বারাণসী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্ঞাতিভ্রাতা কর্ণাটক বংশীয় মিথিলার রাজা নান্যদেবকে

পরাজিত করিয়া বিজয়সেনের বিজয়বাহিনী কাশী আক্রমণ করিয়াছিল। পূব দিকে কামরূপ পর্যন্ত তিনি জয় করিয়াছিলেন। এই নূতন গৌড় সাম্রাজ্যের সীমা পশ্চিমে বারাণসী, পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আরাকানরাজের সহিত বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণ সেনের বিবাদ, কাশীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন, কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয় প্রভৃতি কাহিনী হইতে এইটুকু অন্ততঃ মনে হইতে পারে যে বিজয় সেনের দিগ্বিজয় কাহিনী অলীক নহে। লিপি ও প্রশস্তি লিখিত কাহিনীর যথার্থতা নিরূপণে প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু বাংলার ও বাংলার বাহিরের সমস্ত শিলা ও তাম্রলিপির কাহিনী সমগ্র ভাবে ধরিয়া নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সেন বংশীয় নরপতিগণ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়বঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্য বিস্তারে অনতিদীর্ঘ হইলেও মুসলমান বিজয়ের পূর্বে ইহাই বাঙ্গালীর শেষ সাম্রাজ্য।

বাঙ্গালীর ধর্ম

আমরা বাঙ্গালী; আজ আমরা প্রায় সকলেই হিন্দু। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষগণ কোন্ ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাহা জানিতে আমাদের ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক।

অতি প্রাচীনকালে, খৃষ্টের জন্মের বহুশত বৎসর পূর্বে, উত্তর পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম-প্রচারকেরা পূর্ব ভারতে, বিহারে ও বঙ্গে তখনও প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। এই দুই দেশের অধিবাসীরা কোন্ ধর্মে বিশ্বাসবান

ছিল তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। অবশ্যই আর্যেতর কোন ধর্ম তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ঋগ্‌বেদের আরণ্যক এবং ব্রাহ্মণ অংশে বঙ্গবাসীদিগকে চটক এবং পারাবতের ন্যায় দুর্বলতা, দুরাহার এবং বহুঅপত্যতা দোষে দুষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পৌণ্ড্র দেশবাসীকে শবর ও পুলিন্দ প্রভৃতি দস্যুজাতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী অথর্ববেদের কোন ঋষি এই বলিয়া কামনা প্রকাশ করিয়াছেন যে,—অভিশাপ স্বরূপ জ্বর নামক ব্যাধি সুসভ্য আর্যজাতিকে পরিত্যাগ করিয়া অসভ্য পৌণ্ড্র এবং বঙ্গ জাতিকে আক্রমণ করুক।

কালক্রমে আর্যসভ্যতার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বহু আর্যসন্তান বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ পরশুরামই সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, লৌহিত্য তীর্থ পরশুরাম কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে লৌহিত্য তীরবর্তী এবং বাংলার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা অনার্য ভাবাপন্ন এবং বৈদিক আচারভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণেই ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মনু তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে অঙ্গবঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে দ্বিজাতিকে পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। সূত্রকার ঋষিরাও বঙ্গদেশে গমনকারী আর্যদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোটের উপর এমন একটা সময় উপস্থিত হইয়াছিল, যখন উত্তর ভারতের বৈদিক ধর্মাবলম্বী আর্যগণ পূর্ব ভারতীয় বাঙ্গালীকে অত্যন্ত হেয় এবং অপবিত্র মনে করিতেন। বাঙ্গালীরা ঐ সময়ে কোন আর্যধর্ম গ্রহণ করে নাই বলিয়াই হউক অথবা পূর্ব ভারতে বৈদিকধর্ম সুপ্রতিষ্ঠ

হইবার পূর্বেই বাঙ্গালীদের মধ্যে ব্রহ্মণ্যধর্মের বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়াই হউক, ব্রহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ বাঙ্গালীদিগকে ভিন্নধর্মাবলম্বী বলিয়া অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিল।

ঋষি দীর্ঘতমার আশীর্বাদে মহারাজ বলি এবং রাণী সুদেষ্ণা, পুণ্ড্র, বঙ্গ প্রভৃতি পুত্রলাভ করিয়াছিলেন। এই পুণ্ড্রই পুণ্ড্ররাজ্যের এবং এই বঙ্গই বঙ্গরাজ্যের স্থাপয়িতা বলিয়া কথিত আছে। ঋষি দীর্ঘতমার কাহিনী বৈদিক যুগের প্রাচীনতম উপাখ্যানের অন্যতম। বঙ্গ ও সুহ্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বৈদিক ঋষি ও রাজার সংস্রব দৃষ্টে মনে হয় যে, অতি প্রাচীনকালেই উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে আর্যধর্ম বিস্তারের চেষ্টা কতকাংশে সফল হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বাংলার অজ্ঞাতধর্মী আদিম অধিবাসীদের সংস্পর্শে অথবা উত্তর-পূর্ব দেশ হইতে সমাগত অন্য কোনও অজ্ঞাতধর্মের প্রভাবে এই বৈদিক ধর্ম বহুলাংশে সঙ্করধর্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণ শাস্ত্রে ভাগবতধর্ম-প্রচারক বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত পৌণ্ড্রক বাসুদেবের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প লিখিত আছে সেই গল্প এই কল্পনাকে সমর্থন করে। সূত্র ও ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই জন্যই বঙ্গদেশকে অপাংক্তেয় এবং পুণ্ড্রদেশকে দস্যু-অধ্যুষিত বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।

এই অর্ধেক আর্য এবং অর্ধেক অনার্য বাঙ্গালী ধর্ম পুনরায় বৈদিক সংস্কৃতি লাভ করিবার পূর্বেই প্রায় তিন শত খৃষ্টপূর্বাব্দে সমতট-সমন্বিত সমগ্র বাংলা দেশ বৌদ্ধপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল।

সম্রাট্ অশোকের ধর্মবিজয়ের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতের বহুদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাংলা দেশেও এই সময় নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বৈদিকধর্ম

যেখানে দৃঢ়ভিত্তি অর্জন করিতে পারে নাই বৌদ্ধধর্ম সেখানে অবিমিশ্র প্রাধান্য লাভ করিল। সমতট বিক্রমপুরের ধর্মরাজিকা ও অন্যান্য ভগ্নস্তূপ এবং বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নবাবিষ্কৃত ভূথারাজি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে যে বাংলার সর্বত্র,—পল্লীতে পল্লীতে—প্রাক্‌খৃষ্টীয় যুগে বৌদ্ধধর্মের বিপুল প্রভাব ছিল। হুয়েনসাঙ্‌ও বাংলায় ভ্রমণকালে পুণ্ড্রবর্ধন-সমতট-কর্ণসুবর্ণ এবং তাম্রলিপ্তে অর্থাৎ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বহু অশোকস্তূপ দেখিয়াছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, এই সময়ে অধিকাংশ বাঙ্গালীই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুঙ্গ, কন্ব ও অন্ধ্র বংশীয় নরপতিদের শাসন সময়ে বাঙ্গালীর ধর্মের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। খৃষ্টীয় যুগের কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মণ্যধর্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দের রাজত্বকালে ব্রহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষে মহা-সমারোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যেও এই সময়ে অনেকে ব্রহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে পূর্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে যে কয়জন মহারাজার নাম পাওয়া যায় তাঁহারা হিন্দু ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। তাঁহাদের প্রজারা অনেকেই রাজধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্মণ্যধর্মের এই অধিকার বাংলা দেশে বহুদিন অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে নাই। গুপ্ত পরবর্তী যুগে কনৌজাধিপতি যশোবর্মা লৌহিত্যতীর অবধি সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি তথাগত বুদ্ধের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁহার সময়ে হয়ত বঙ্গদেশে আর একবার বৌদ্ধধর্মের প্লাবন আসিয়াছিল। কথিত আছে এই সময়ে লৌহিত্যতীরে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রক্তপিপাসু ব্রাহ্মণগণ

যশোধর্মার ভয়ে শঙ্কান্বিত হইয়া গভীর নিশীথে পশুহত্যা করিয়া কোনওমতে ব্রহ্মণ্যধর্ম রক্ষা করিয়াছিল। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গদেশ একাদিক্রমে বৌদ্ধ সম্রাট্ ও নৃপতিগণের অধীনেই শাসিত হইয়া আসিতেছিল। হুয়েনসাঙ-এর সময়ে বাংলাদেশে সত্যধর্ম অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম এবং অপধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্ম,—এই উভয় ধর্মের বিশ্বাসিগণই বসবাস করিত। মন্দির ও সঙ্ঘারাম প্রায় সমভাবেই সমগ্রদেশে বিচ্ছুরিত ছিল। হুয়েনসাঙ বর্ণিত যে ব্রহ্মণ্যধর্ম বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রায় সমকক্ষ ছিল তাহা হর্ষবর্ধন-শিলাদিত্যের ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শশাঙ্ক-নরেন্দ্রাদিত্যের শৈব হিন্দু ধর্মানুরাগের ফলেই শক্তিশালী হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

হুয়েনসাঙ-এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধশ্রমণের সংখ্যা বহুল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বাংলার একজন উদ্যমশীল বৌদ্ধ নরপতির দ্বারাই ইহা সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধ নরপতি কে তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। কিন্তু এই সময়ে একদা বিস্মৃত খড়্গ রাজগণ পূর্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগে কিয়ৎ পরিমাণে কনৌজ বা মগধের শাসনাধীনে থাকিত। কিন্তু নদীখালবিল পরিবেষ্টিত পূর্ব এবং মধ্য বঙ্গে উহাদের প্রভাব সহসা প্রবেশলাভ করিতে পারিত না। প্রবেশ করিলেও স্থায়ী হইতে পারিত না। এই কারণেই মগধ বা কনৌজের রাজধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ধর্ম পরিবর্তন সেইরূপ সহজ ছিল—পূর্ব ও মধ্য বঙ্গে সেইরূপ ছিল না। এই কারণেই অশোক-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম প্রাচ্যবঙ্গে যে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ব্রহ্মণ্যধর্মের

পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত তাহার প্রভাব বিশেষ খর্ব হইতে পারে নাই।

এই সময়ে বঙ্গদেশে এক নূতন ধর্ম বিপর্যয় উপস্থিত হইল। এই যুগ তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবের যুগ। তন্ত্রশাস্ত্র যেখান হইতেই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া থাকুক বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ উভয়েই ইহাকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। ফলে বাংলাদেশে তান্ত্রিক হিন্দু এবং বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাব হইল। বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম জনপ্রিয় হইবার লোভে চক্রযান-বজ্রযান-ও-মন্ত্রযানে পর্যবসিত হইল এবং ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তিত হইয়া গেল। বাঙ্গালী বৌদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দুর বহু দেবদেবী ও আচারানুষ্ঠান স্বধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। এই ধর্ম বিপর্যয়ের যুগেই বাঙ্গালী মীননাথ বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে নাথধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

অপরিমেয় বলশালী পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা সুদূর কনৌজ হইতে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন না। তাঁহারা ছিলেন বাঙ্গালী এবং বঙ্গদেশ ছিল তাঁহাদের জন্মভূমি। সুতরাং ধর্মবিষয়ে পালরাজগণ পরমতসহিষ্ণু থাকা সত্ত্বেও এই সময়ে বাঙ্গালীরা অনেকেই রাজধর্ম বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী পালরাজগণের সমসাময়িক পূর্ব ও মধ্য বঙ্গের চন্দ্ররাজগণও বৌদ্ধ ছিলেন। সুতরাং সমগ্র বঙ্গেই এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার।

কিন্তু হিন্দুগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। পালসম্রাট্‌দের বলদৃপ্ত বাহু শিথিল হওয়ার পূর্বেই বাংলায় হিন্দু প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। আদিশূরের কাহিনী বঙ্গীয় কুল-পঞ্জিকাকারগণের কল্পনামাত্রও হইতে পারে। কিন্তু আদিশূর ও বঙ্গে ব্রাহ্মণ-আনয়নমূলক কিংবদন্তীর মধ্যে এইটুকু সত্য আবিষ্কার করা যায় যে, কোনও এক সময়ে বাংলাদেশে

বৈদিক আচারানুষ্ঠান লোপ পাইতে বসিয়াছিল। বঙ্গদেশীয় কোনও একজন নরপতি বাঙ্গালী সমাজে বৈদিক আচার-ব্যবহার পুনঃ সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের কোনও স্থান হইতে বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন কয়েকজন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আমদানী করিয়াছিলেন। আদিশূর সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর মূল যে বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই বৌদ্ধ-বিরোধী ব্রাহ্মণ্যধর্ম ক্রমেই বঙ্গদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিল। পূর্ব ও মধ্য বঙ্গের বর্মন রাজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। কথিত আছে যে বর্মন বংশীয় রাজা হরিবর্মার বেদই একমাত্র অবলম্বন ছিল; নগ্ন এবং বৌদ্ধ ক্ষপণকদিগের মত তিনি অবৈদিকাচার-সম্পন্ন ছিলেন না। তিনি 'ধর্মবিজয়ী' ছিলেন। ধর্মস্থাপন করিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়া বিধর্মী দলন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণাবতার' বলা হইত। মনে হয় হরিবর্মা 'নিখিল-শাস্ত্রাস্ত্র নিপুণ-পরিজ্ঞান-লব্ধানল্প-বৈচক্ষণ্য-বালভট্ট-ভট্টাচার্য-গর্গ-বাচস্পতি' প্রমুখ সপ্ত সচিবের সহায়তায় বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে বৈদিক ধর্মের বহুল প্রচার করিয়াছিলেন। জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতি বিধর্মিগণের 'শর্ম-সংমর্দন-কারী' এই হরিবর্মার মন্ত্রী বিখ্যাত ভবদেব ভট্টও বৌদ্ধরূপ সমুদ্রের অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৈতণ্ডিকগণের প্রজ্ঞা খণ্ডনে মহাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই রাজা ও রাজসচিবের সম্মিলিত চেষ্টায় বঙ্গদেশের একাংশে বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইতে বসিল। বর্মনদের সময়ে আর একদল বৈদিক ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। কথিত আছে যে, মহারাজ শ্যামলবর্মাদ্বারা বঙ্গদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল। এই সকল কিংবদন্তী

এবং ইতিহাসই হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের প্রমাণ বহন করিতেছে।

বর্মণ বংশ সেন বংশ কর্তৃক উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। ধর্ম সম্বন্ধে সেনগণ বর্মণগণের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন। যদিও সেনরাজগণের মধ্যে কাহারও কাহারও যৌবনে তান্ত্রিকতার প্রতি পক্ষপাত দৃষ্ট হয় তথাপি মোটের উপর বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন যে হিন্দু ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বিজয়সেন বৈদিকধর্মে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বিজয়সেনের এই অনুরাগের ফলে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রভূত বিত্তশালী হইয়াছিল। বল্লালসেনও 'ধর্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়েই হিন্দুর জীমূতবাহন হিন্দুর দায়ভাগ প্রণয়ন করেন। হলায়ুধ, পশুপতি ও ঈশান,—এই পণ্ডিত ভ্রাতৃত্রয় বিভিন্ন বেদের আচার এবং অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া হিন্দু সমাজ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক ও তান্ত্রিক ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া 'বাৎস্য-সূক্ত' এই সময়েই তন্ত্রাচারী বাঙ্গালাদিগকে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিল। হিন্দুধর্মের এই জাগরণ ও উদ্দীপনার স্রোতে বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়া গেল। বৌদ্ধ-তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠানের ভগ্নাবশেষ হিন্দুধর্মের বিশাল অবয়বে মিশিয়া গেল। তাই খৃষ্টের জন্মের দুই একশত বৎসর পূর্বে যে বাঙ্গালী প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ছিল—আজ সেই বাঙ্গালী প্রায় সকলেই হিন্দু। যে অল্পসংখ্যক মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু বৌদ্ধধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল মুসলমান আক্রমণে তাহাও নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

বাঙ্গালীর নূতন ধর্ম

শ্রীচৈতন্যদেবকে আমরা বাঙ্গালীর সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ধর্ম প্রচারক বলিয়া জানি। শ্রীচৈতন্য আমাদের গৌরব। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাবের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্বে আমাদের বাংলাদেশে এক সাধক এবং ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তৎকালে তাঁহার যশঃ সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছিল। নাগার্জুন বা চৈতন্যদেবের মত তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন না। তাঁহার শাস্ত্রাধ্যয়নের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা পাই নাই। কিন্তু যে স্বাভাবিক ঐশ্বরিক শক্তি কবীর ও নানককে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বের সহজ সরল ব্যাখ্যা করিবার অননুকরণীয় যোগ্যতা দিয়াছিল—তাহা তাঁহার ছিল। যে সাধনা গৌতম ও মহাবীরকে নব জীবনের পথ দেখাইয়াছিল—সেই সাধনায় তাঁহার জীবন সমৃদ্ধ ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বাংলার এই ধর্ম প্রচারকের জন্ম হইয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া পরবর্তীকালে এই নূতন ধর্ম উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লোক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বহু ভারতীয় পণ্ডিত ও ধর্ম ব্যাখ্যাতা প্রচারকরূপে অন্তর্ভারতীয় যশঃ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ যুগেও একজন বাঙ্গালী প্রচারিত একটি নূতন ধর্ম বহির্বঙ্গে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। ইহা খুব অল্প গৌরবের কথা নহে।

এই ধর্ম প্রচারকের নাম মীননাথ। তিনি যে নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার নাম—নাথধর্ম। পরবর্তীকালে এই ধর্ম যোগধর্ম বা সহজধর্ম নামে পরিচিত হইয়াছিল।

মীননাথের জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। উপাখ্যানের ভিতর হইতে শুধু এইটুকু জানা যায় যে, তিনি যোগীরূপী শিবের নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবপত্নী গৌরীর রূপে

মুগ্ধ হইয়া গৌরীকে কামনা করায় তিনি শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথ তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন। তাঁহার জীবন বর্ণনায় তাঁহাকে সর্বদাই গুরু ধন্বন্তরী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তাঁহাকে 'চন্দ্রদ্বীপ বিনির্গত' এই বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। কোথাও কোথাও বর্ণিত হইয়াছে যে "বরণা বঙ্গিদেশে" তাহার জন্ম। সুতরাং মীননাথের বাড়ী পূর্ববঙ্গের কোথাও ছিল—এইরূপ অনুমান করা যায়। মীননাথ কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। যে সকল প্রাচীন পুঁথিতে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়—তাহার অধিকাংশই নবম, দশম বা একাদশ শতাব্দীর। এই সকল পুঁথিতেই মীননাথকে দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষ-মীননাথকে দেবতা-মীননাথ হইয়া যাইতে নিশ্চয়ই কয়েক শতাব্দীর প্রয়োজন হইয়াছিল। মানুষ বুদ্ধ বহু শতাব্দীর পর অবতার বুদ্ধ হইয়াছিলেন। মীননাথও নিশ্চয়ই বহু শত বৎসর পর দেবতার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই অনুমান বলে পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মীননাথ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে নাথধর্মের প্রারম্ভ এই যুগেই হইয়াছিল। ইহার প্রথম প্রচারক মীননাথ। মীননাথের বহু নামান্তর ছিল। মীনপদ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মচ্ছিন্দ্রনাথ, মৎস্যেন্দ্রপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ প্রভৃতি মীননাথেরই বিভিন্ন নাম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। মীননাথ কোথায় কোথায় কিভাবে ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এই কথা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রচার উপলক্ষে নেপাল পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

কাণুপা নামক আর একজন বাঙ্গালী সিদ্ধ যোগীর কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি। ইনি হয় মীননাথের সমসাময়িক নচেৎ তাঁহার

এক পুরুষ পরবর্তীকালে নাথধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

বাংলার প্রাচীন গীতিকার মধ্যে মাননাথ, কাণুপা ও নাথধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ শ্রুতিসুখকর গল্প বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার ঐতিহাসিকতা কতটুকু আমরা জানি না। তবে একথা সত্য যে, খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে মাননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ নামক চন্দ্রদ্বীপের এক বাঙ্গালী একটি নূতন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই ধর্ম বঙ্গের বাহিরে বহুস্থানে প্রচার লাভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর জ্ঞানশ্রী তিব্বতে তথাগত বুদ্ধ অপেক্ষাও অধিক পূজা এবং শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ মাননাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথও আজ পর্যন্ত নেপালে পদ্মপাণি বুদ্ধের অবতার হিসাবে প্রণম্য হইয়া আছেন। আজও নেপালে মহাসমারোহে মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কিরূপ পরিবেশের ভিতর এই নূতন ধর্মের প্রবর্তন সম্ভব হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃই অজ্ঞ জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দশশীল ও অষ্টশীল ত দূরের কথা পঞ্চশীলের অনুষ্ঠানও এইরূপ কঠিন ছিল যে, অধিকাংশ গৃহস্থই উহা আচরণ করিতে পারিত না। ফল হইয়াছিল এই যে, সমাজের এক বিরাট অংশ বৌদ্ধ-ধর্মের স্বীকৃত ত্রিসীমার বহির্দেশে বিশৃঙ্খল জীবন যাপন করিত। কি হিন্দু কি বৌদ্ধ কোন ধর্মই ইহাদিগকে স্বীকার করিত না। ইহাদের সামাজিক জীবন অপাংক্তেয় এবং পারিবারিক জীবন ধর্মসংস্পর্শশূন্য ছিল। ইহাদের নৈতিক জীবনে বহুপ্রকার ঘৃণ্য অসদাচার প্রবেশ লাভ করিয়া সমাজদেহে একটা দুষ্ট ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সুপণ্ডিত বৌদ্ধ প্রচারক অথবা আত্মাভিমানী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দৃষ্টি সমাজের

এই ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয়ের দিকে আদৌ আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু সাধক মীননাথ সমাজের এই দুরবস্থা দিব্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অসদাচার ও বিশৃঙ্খলার গভীর ক্লেদ হইতে সমাজের এই বিরাট অংশকে উদ্ধার করিয়া ইহাকে ধর্মস্থ করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা মীননাথের মনে জাগরূক হইল। তিনি বৌদ্ধধর্মের জটিল দর্শনতত্ত্ব এবং কঠিন অনুষ্ঠানগুলি পরিত্যাগ করিয়া কোটি কোটি নিরক্ষর ও অজ্ঞলোকের উপযোগী এক নূতন সহজধর্ম প্রচার করিলেন। ইহাই নাথধর্ম বা যোগীধর্ম। চৈতন্যদেবও অনুরূপ উদ্দেশ্য লইয়াই পরবর্তী কালে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই হিসাবে মীননাথ চৈতন্যদেবের পথপ্রদর্শক।

নাথধর্মে নয়জন সিদ্ধাই বা সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। বাঙ্গালী কানুপা তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এই নাথধর্ম যাহার অক্লান্ত চেষ্টা এবং অলৌকিক শক্তির বলে ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল—তাঁহার নাম সিদ্ধাই গোরক্ষনাথ। তাঁহার জন্মস্থান পাঞ্জাবের জলন্ধর প্রদেশে। তিনি বাংলার রাণী ময়নামতীর মন্ত্রগুরু ছিলেন। তিনি মীননাথের সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

মহারাজ অশোকের আনুকূল্যে যেমন বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইয়াছিল, গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন নরপতির সহায়তায় নাথধর্মও সেইরূপ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রসার লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গদেশের একজন রাজা। হয়ত গীতিকাপুঁথির গোপীচন্দ্র এবং ইতিহাসের গোবিন্দচন্দ্র একই ব্যক্তি। তাঁহার নাথধর্ম গ্রহণের মূলে সিদ্ধাই গোরক্ষনাথের প্রভাব ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। নাথধর্ম-দীক্ষিত গোবিন্দচন্দ্রের খ্যাতি বঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বহু জনপদে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দচন্দ্র

এবং তাঁহার মাতা ময়নামতীকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট কথাসাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাকে নাথধর্মের প্রচার-সাহিত্য বলা যাইতে পারে। উত্তরবঙ্গে ও পূর্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর বহু গান আবিষ্কৃত হইয়াছে। উড়িয়া ভাষায় লিখিত একখানি গোবিন্দচন্দ্রের গীতি ময়ূরভঞ্জে পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গ লইয়া মহারাষ্ট্র দেশে এখনও নাটক রচিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রবিবর্মা গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস শীর্ষক যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভাগলপুর, কাশী এমনকি পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দি ভাষায় বিরচিত 'গোবিন্দচান্দকা পুঁথি'র প্রচলন আছে। মহারাষ্ট্রের কবি মহীপতি এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার 'সপ্তলীলামৃত' এবং পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ এই প্রসঙ্গ লইয়া 'গোপীচান্দ নাটক' রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রমাণদৃষ্টে মনে হয় নাথধর্ম একদিন ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল এবং নাথধর্মের পৃষ্ঠপোষক রাণী ময়নামতী এবং তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের গল্প উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জনসাধারণের মুখে মুখে কীর্তিত হইয়া এক অপূর্ব লোকসাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল। যে বঙ্গীয় রাজা ও রাণীকে লইয়া সমগ্র ভারত কোন না কোন সময়ে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং যে বঙ্গীয় ধর্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে লোকধর্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছিল—সেই রাজারাণী এবং সেই ধর্ম—উভয়েই বাঙ্গালীর গৌরব সন্দেহ নাই।

গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের ইতিহাস সন্দেহের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। হয়ত তিনি এবং বাংলার চন্দ্রবংশোদ্ভব গোবিন্দচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি। হয়ত তিনি ভিন্ন কোন রাজা। বাংলার বহু ঐতিহাসিক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে। যে গোবিন্দচন্দ্রের

যশঃ ভারতের সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অনুসন্ধিৎসু কোনও বাঙ্গালীর উদ্যোগে তাঁহার বহু ঐতিহাসিক তথ্য হয়ত বাংলার গ্রামে গ্রামে অনাবিষ্কৃত গীতিকায় ও লেখমালায় পাওয়া যাইতে পারে।

বাঙ্গালীর মনীষা

আমরা বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর বাহুবল, শৌর্য্য ও বিক্রম আমাদের গৌরব। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের গৌরবও আমাদের কম শ্লাঘার বস্তু নয়। বাঙ্গালীর পরাক্রম ও শক্তির অধিকাংশ কীর্তি আজও ইতিহাসের অন্ধকার গর্ভে নিহিত। বাংলার মহারাজাধিরাজদের বিজয়যাত্রা আজও প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু। বাংলার অধিপতিদের লেখমালায় বর্ণিত বিশেষণ ও কাহিনীর অধিকাংশই অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী রাজকবির অতিশয়োক্তি বলিয়া উপেক্ষিত। সুতরাং বাঙ্গালীর বাহুবল ও দিগ্বিজয়ের ইতিহাস যৎসামান্যমাত্র আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বাংলার বিদ্যা ধর্ম ও জ্ঞানের ইতিহাস উজ্জ্বলতর আলোকে উদ্ভাসিত। তাই শৌর্য্যবীর্য্যাপেক্ষা জ্ঞানৈশ্বর্য্যই আমাদের অধিকতর গৌরবের সামগ্রী। গৌড়বঙ্গ-মগধাধিপতিদের দিগ্বিজয় কার্য্যতঃ উত্তর ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাহাদের আশ্রিত পণ্ডিতগণের ধর্ম-ও-জ্ঞান-বিজয় আসমুদ্র হিমাচল অতিক্রম করিয়া সমগ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল। শশাঙ্ক, ধর্মপাল ও বিজয়সেনের যুগে গৌড়বঙ্গ ভারতের অন্যতম শক্তিশালী রাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। অপরদিকে শীলভদ্র-দীপঙ্কর-ভবদেব প্রভৃতির সময়ে গৌড়বঙ্গ জ্ঞান-বিদ্যা-ও-ধর্ম-বিষয়ে সমগ্র সুসভ্য এশিয়ার ভারকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল।

বৌদ্ধধর্মের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া খৃষ্টের জন্মের বহু বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে একটি সংস্কৃতিচক্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সংস্কৃতিচক্রের প্রভাবে ভারতবর্ষে অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী অধ্যাপকদের দান চিরস্মরণীয়। আজও ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বাঙ্গালী অধ্যাপকদের জ্ঞান-গরিমায় সমুজ্জ্বল। বাংলার এই কৃষ্টিধারা গঙ্গাস্রোতের মতই নিরবচ্ছিন্ন ও গভীর। প্রাক্-মুসলমান যুগেও বাঙ্গালী অধ্যাপকদের খ্যাতি তক্ষশিলা হইতে বিক্রমশীলা পর্য্যন্ত পূর্বাপর ভারতবর্ষের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

এইরূপ একজন অধ্যাপকের নাম ছিল—শীলভদ্র। সেই যুগে,—একদা দক্ষিণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মগধাধিপের রাজসভায় আসিয়া উত্তর ভারতের মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ধর্মপালের সহিত বিতর্ক প্রার্থনা করিলেন। এই তর্কযুদ্ধের গুরুত্ব ছিল সুগভীর। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই তর্কযুদ্ধের জয়-পরাজয়ের উপর উভয় ভারতের প্রাধান্য নির্ভর করিবে। হয় উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের পদানত হইবে; নচেৎ দক্ষিণ ভারত উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। ধর্মপাল তখন বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বহু ধুরন্ধর পণ্ডিত ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতের সম্মুখীন হইতে কাহারও সাহস হইল না। অগত্যা ধর্মপালই বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বাঙ্গালী শীলভদ্র তখন নালন্দার ছাত্র। বয়স তখন তাঁহার ত্রিশ বৎসর। খ্যাতি তখন পর্য্যন্ত তাঁহার নালন্দা-বিহারের প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যায় নাই। আত্মবিশ্বাস তাঁহার সুগভীর। বিদ্যা পরীক্ষার এই সুবর্ণ সুযোগ তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। গুরুর পরিবর্তে স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতের সহিত

বিতর্ক-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার অনুমতি তিনি প্রার্থনা করিলেন। অন্যান্য শিষ্য উপহাস করিল। মগধের জনসাধারণ ইতস্ততঃ করিল। কিন্তু ধর্মপাল শিষ্যের গভীর বিদ্যাবত্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনি ত্রিংশ বর্ষীয় ছাত্র শীলভদ্রকে দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী পণ্ডিতপ্রবরের সহিত তর্ক-যুদ্ধ করিবার জন্য মগধের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। রাজসভা লোকে লোকারণ্য। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের জনগণ ফলাফলের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। এক তরুণ যুবকের হস্তে উত্তরাপথের গৌরব রক্ষার ভার ন্যস্ত হওয়ায় উত্তরাপথবাসিগণ সকলেই ক্ষুব্ধ। কিন্তু সভান্তে বাঙ্গালী শীলভদ্র যখন প্রদীপ্ত ললাটে জয়টীকা ধারণ করিয়া সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—তখন সমবেত জনতার জয়ধ্বনিতে পাটলীপুত্র নগর বধির হইয়া গিয়াছিল। শীলভদ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীপূর্বে উত্তর ভারতের জ্ঞানগৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গের এক ব্রাহ্মণ রাজবংশে শীলভদ্রের জন্ম হয়। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি ভারতের প্রত্যেক বিদ্যায়তনে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি নালন্দা মহাবিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নালন্দার অধ্যক্ষ তখন পরম-জ্ঞানী মহাস্থবির ধর্মপাল। তাঁহার মুখে জটিল ধর্মশাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়া শীলভদ্র তাঁহার নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। নিজের ধীশক্তি-প্রভাবে তিনি এই মহাবিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হন। ধর্মপালের তিরোধানের পর শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হন।

নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিশ্ববিশ্রুত, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের নামও সেইরূপ সর্বদেশের সমস্ত পণ্ডিতগণের মধ্যেই পরিচিত। এক সময়ে ভারতে এবং বহির্ভারতে শীলভদ্রের সম্মান ও

প্রতিষ্ঠার অবধি ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক সুপণ্ডিত হুয়েন সাং শীলভদ্রের মনীষা এবং সম্মান দর্শনে তাঁহার চরণ চুম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শীলভদ্রের অধীনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দেড় সহস্র অধ্যাপক নিযুক্ত ছিল। ঐ সময়ে দশসহস্র ছাত্র ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপকগণ বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যিনি সমস্ত শাস্ত্র ও বিদ্যা অধিগত করিতে পারিতেন তিনিই প্রধান অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইতেন। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সাহিত্য ও দর্শনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহার অধ্যাপক-গণের প্রত্যেকেই এক এক শাস্ত্রের দিকপাল ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, শৃঙ্খলা-রক্ষার সুচারু কৌশল এবং অচ্ছেদ্য যুক্তিসমন্বিত বাক্‌পটুতার অধিকারী না হইলে এই দিকপাল পণ্ডিতগণের সর্বাধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। শীলভদ্র এই সমস্ত গুণের অধিকারী ছিলেন। হুয়েন সাং যখন শীলভদ্রের প্রজ্ঞা ও বাক্‌পটুতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন শীলভদ্রের বয়ঃক্রম তখন একশত ছয় বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে এই নিক্লেশ নির্বিকার মহাত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন।

শীলভদ্রের তিনশত বৎসর পরে অপর এক বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের কীর্তিকথা ভারত পরিপ্লাবিত করিয়া ব্রহ্মদেশ, তিব্বত এবং চীন পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিলে তাঁহার যশঃ ও খ্যাতির সঠিক পরিমাণ করা হয় না। সমগ্র ব্রহ্মণ্য এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের নমস্য হইয়াছিলেন। সুবর্ণভূমি ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা নিবেদন করিত। তিব্বতের জনসাধারণ তথাগত বুদ্ধের

নাম শ্রবণ করিয়া আজ আর ভক্তিরসাপ্লুত হইয়া উঠে না। কিন্তু এই বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম উচ্চারিত হইলেই তাহারা যন্ত্রচালিতের মত ললাটে হস্ত সংস্পৃষ্ট করে। লামা এবং চীন সম্রাট্ তাঁহার নামের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন পূর্ব পর্য্যন্তও সিংহাসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া উদ্দেশ্যে করযোড়ে নমস্কার জ্ঞাপন করিতেন। এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রথিতযশা বাঙ্গালী পণ্ডিতের নাম দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৯৮০ খৃঃ অব্দে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তাঁহার শৈশবের নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ। তাঁহার মাতা প্রভাবতী বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিব্বতে জনৈক শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মাতার নিকটই বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মাতার নিকট শৈশব শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জেতারি নামক জনৈক অবধূতের নিকট তিনি শিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি উদণ্ডপুর মহাবিহারে মহাসাঙ্ঘিক আচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নাম প্রাপ্ত হন।

বিদ্যানুরাগ ও জ্ঞানানুসন্ধিৎসায় চঞ্চল হইয়া দীপঙ্কর বিভিন্ন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণের সহিত সংস্পর্শমানসে সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। কৈশোরে ও যৌবনের প্রথমভাগে সমগ্র ব্রহ্মণ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৌদ্ধপণ্ডিত রাহুল গুপ্তের নিকট বৌদ্ধ ত্রিশিক্ষায় জ্ঞানলাভ করেন। তাঁহার বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন

তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসীম গৌরব লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সমস্ত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া এবং প্রায় সমগ্র বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ভারতবর্ষ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারিবে না। অথচ তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছুতেই তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তৎকালে সুবর্ণদ্বীপ ব্রহ্মদেশ প্রাচ্য জগতে বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশ্রুতকীর্ত্তি আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহারই নিকট যাইতে মনস্থ করিলেন। একখানা সুবৃহৎ বাণিজ্য-তরণীতে আরোহণ করিয়া সুদীর্ঘ তের মাস প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে বহু বিঘ্ন ও অমঙ্গলের সম্মুখীন হইয়া জ্ঞানান্বেষী বাঙ্গালী যুবক সুবর্ণদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি দ্বাদশ বৎসর জ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন। মগধে ফিরিয়া আসিলে পর মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মগধের ধর্মপালরূপে মনোনীত করিলেন। বৌদ্ধ-ধর্মের সংরক্ষক হিসাবে ইহা ভারতীয় বৌদ্ধ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। অতঃপর তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ হন। সেই সময়ে বিক্রমশীলা বিহারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নালন্দা বিহার অপেক্ষাও অধিক ছিল। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ বিক্রমশীলা হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া শুধু ভারতবর্ষে নয়,—বহির্ভারতেও বিদ্যা এবং ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা-বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন সুবিখ্যাত তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু

প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিত বিক্রমশীলার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ হওয়া গভীর পাণ্ডিত্য এবং দুষ্প্রাপনীয় সৌভাগ্যের কথা।

অধ্যক্ষ হিসাবে দীপঙ্কর গভীর শৃঙ্খলাবোধ ও সুকঠোর তত্ত্বাবধানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কোন অপরাধ করিলে তিনি উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কাহাকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দিবাকর চন্দ এবং মহীপাল নামক দুইজন দুর্দ্ধর্ষ ছাত্রকে তিনি শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে বিক্রমশীলা বিহার হইতে বিতাড়িত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। সেই সময়ে আঠারটি বিদ্যানিকেতন বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই আঠারটি বিদ্যায়তনের জন্য আঠারজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে শিক্ষা-পটু করিয়া তুলিবার জন্য দীপঙ্কর একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। মনে হয় শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান ব্যবস্থার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। অধ্যক্ষ দীপঙ্কর তদধীন বিদ্যায়তনগুলির শাসন-পরিচালন ও অধ্যাপনা-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যায়তনে অবস্থান করিতেন।

দীপঙ্কর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত,—বৌদ্ধধর্মের দিকপাল। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও ধর্মকে তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবনের মুক্তির সোপান হিসাবেই গ্রহণ করেন নাই। জরা ব্যাধি ও মৃত্যু-ক্লিষ্ট, পাপ ও তাপে জর্জরিত পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর দিকে দৃকপাত না করিয়া তিনি নিজের বা কোন বিশেষ ধর্মগোষ্ঠীর মুক্তির জন্য লালায়িত ছিলেন না। সমগ্র মানব-সমাজের মুক্তির জন্য তিনি নিজের জ্ঞান ও ধর্মবোধকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যৌবনের ভোগবিলাস তাঁহাকে

আকর্ষণ করিতে পারে নাই ; বার্ধক্যের জড়তা তাঁহাকে পঙ্গু করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের দুইটি ঘটনা তাঁহার এই বিশ্বজনীন সেবাবোধের উদাহরণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

তীর্থিক ধর্মাবলম্বী চেদিরাজ কর্ণদেবের সহিত দীপঙ্করের জীবদ্দশাতেই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী বঙ্গরাজ নয়পাল দেবের মারাত্মক সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল। এই মরণ-যজ্ঞে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সহস্র সহস্র লোককে আত্মাহুতি দিতে হইতেছিল। আহতের ক্রন্দন, বিধবার বিলাপ, পুত্রহীনের আর্তনাদ এবং পিতৃহীনের শোক উত্তর ও দক্ষিণের বাতাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিক্রমশীলায় বসিয়া জ্ঞানদানে আর দীপঙ্করের রুচি রহিল না। তিনি বিহার হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। এই নরহত্যা এই নিধনযজ্ঞ বন্ধ করিতে হইবে। শান্তির বাণী লইয়া তিনি একবার চেদিরাজের সিংহাসনের সম্মুখে আবার বঙ্গরাজসভায় উপস্থিত হইলেন। শক্তিমদমত্ত রাজশক্তি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাকুতিতে কর্ণপাত করিল না। কিন্তু দীপঙ্করও মৃত্যুপণ করিলেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত প্রভাব তিনি শান্তিস্থাপনে নিয়োগ করিলেন। তাঁহার মুক্তি-সাধনা—তাঁহার বিদ্যা-চর্চা—তাঁহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা তিনি পরিত্যাগ করিলেন। ক্লেশ-পরিশ্রম-অপমান-অবজ্ঞা সমস্তকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া কখনও রাজপ্রাসাদে, কখনও মন্ত্রণা-পরিষদে, কখনও দক্ষিণ ভারতে, কখনও উত্তর ভারতে, বহু মিনতি বহু উপদেশ বহু আত্মত্যাগের পর অবশেষে দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় মৃত্যুযজ্ঞ বন্ধ হইল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে শান্তি স্থাপিত হইল। উদ্যতায়ুধ চেদিরাজ ও বঙ্গরাজের মধ্যস্থলে প্রসারিত দুই হস্তে তথাগত বুদ্ধের প্রেম ও শান্তির বাণী ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান এক

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর ভাস্বর চিত্র আজও আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।

জ্ঞানলাভের নিমিত্ত দীপঙ্কর যেমন আজীবন কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, আহৃত জ্ঞান বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতেও তিনি সেইরূপ অকুণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তিব্বত ভ্রমণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মে তখন বহুবিধ দোষ ও কুসংস্কার প্রবেশ করিয়াছিল। ধর্মগুরু লামা ইহাতে অত্যন্ত মর্মবেদনা অনুভব করিয়া ধর্ম সংস্কারের জন্য তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্করকে আহ্বান করিলেন। এই আহ্বানে দীপঙ্করের জীবনে এক উভয়সঙ্কট উপস্থিত হইল। তাঁহার বয়স তখন ষাট বৎসর। জরা তাঁহার দেহকে আক্রমণ করিতেছিল। যৌবনের বীর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা বিগতপ্রায়। আজীবন জ্ঞান দান ও জ্ঞান চর্চা করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত-কলেবর দীপঙ্কর এইমাত্র বিক্রমশীলার নির্জন প্রকোষ্ঠে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে অভ্রভেদী হিমালয়ের অপর প্রান্ত হইতে ধর্মের আহ্বান আসিয়াছে। দুর্ভেদ্য দুর্গম পথ; অন্ধকার কুজ্ঝটিকা; দস্যু তস্কর উপদ্রুত পার্বত্য অঞ্চল। কিন্তু যে অন্তর্দেবতা উহার পরপার হইতে দীপঙ্করকে আহ্বান করিতেছেন তাঁহার সে আহ্বানও অলঙ্ঘ্য। দীপঙ্কর কি করিবেন? যে জ্ঞান তিনি আজীবন সাধনা করিয়া সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা কি বিপন্ন ধর্মকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি ব্যয় করিতে পারিবেন না? এ কি শুধু নিরর্থক? মুহূর্তে দীপঙ্করের সমস্ত দুর্বলতা দূরীভূত হইয়া গেল। শুভ মুহূর্তে তিনি তিব্বত যাত্রার সংকল্প করিলেন। তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্য বন্ধু-বান্ধব তাঁহাকে বাধা দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে অনুরোধ করিল। সমগ্র মগধ তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু বিশ্ব-মানবের মুক্তি যাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য কেহই তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিল না। কথিত আছে যাত্রার প্রাক্কালে দীপঙ্কর তাঁহার উপাস্যা তারাদেবীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তারাদেবী তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন—তিব্বতে তাঁহার ধর্মপ্রচার সফল হইবে, কিন্তু তিব্বতে গেলে তাঁহার আয়ু কুড়ি বৎসর হ্রাস পাইবে। জনকল্যাণকামী প্রচারক নিজের আয়ুর দিকে দৃক্পাত করিলেন না। সহস্র সহস্র মানবের আর্ত চীৎকার তাঁহাকে তিব্বতের পথে আকর্ষণ করিয়া লইল।

আমরা বাঙ্গালী, আজও মানস চক্ষে হিমালয়ের উপত্যকায় এক বাঙ্গালী বৃদ্ধকে দেখিতে পাই। মস্তকোপরি তাঁহার শিলা ও তুষার বৃষ্টি, চতুর্দিকে তাঁহার কুজ্ঝটিকার অন্ধকার; সম্মুখে তাঁহার বিশাল অরণ্যানী; উপলসঙ্কুল পথ, তীব্রস্রোতা গিরিনদী, এবং দস্যু-তস্কর এবং ধর্মদ্বেষীর উদ্যত হিংসা; আর পশ্চাতে তাঁহার সমগ্র ভারতবাসীর সকরুণ শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ। তিব্বতে দীপঙ্করের ধর্মযাত্রা সফল হইয়াছিল। তিব্বতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কি সম্মান এবং কি শ্রদ্ধা তিনি সেইখানে পাইয়াছিলেন—তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

বাঙ্গালীর শাসন-ব্যবস্থা

বাঙ্গালীর রাজা বা সম্রাট্ কি ভাবে দেশ শাসন করিতেন তাহার বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। যাঁহাদের জন্মসময়, জীবনের কার্য্যাবলী এবং বিজয়-কাহিনীর ঐতিহাসিকতাই এত সংশয়াচ্ছন্ন যে, যে-কোনও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঐতিহাসিকও সে সম্বন্ধে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহাদের রাজ্য-শাসনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে

আলোচনার ঐতিহাসিক ভিত্তি যে ভঙ্গুর তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের, আলাউদ্দিন খিলিজির, আকবরের এবং শিবাজীর রাজ্যশাসন-প্রণালী কণ্ঠস্থ করিতে করিতে বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে বাঙ্গালী নরপতিদের রাজ্যশাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা হওয়া স্বাভাবিক। মহারাজ শশাঙ্ক কিভাবে রাজ্যশাসন করিতেন? সম্রাট্ ধর্ম্মপালদেবের শাসনতন্ত্র কিরূপ ছিল। বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সুগভীর পাণ্ডিত্য, হলায়ুধ-পশুপতি প্রভৃতির সুনিপুণ শাস্ত্রজ্ঞান বাংলার শাসনব্যবস্থাকে কতখানি উন্নত করিয়াছিল? জাতখড়্গ, গোবিন্দচন্দ্র ও হরিবর্ম্মার সহিত প্রজাসাধারণের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? মুসলমান শাসনের পূর্বে বাংলাদেশের বিচার-বিভাগ, সমরনীতি, শান্তিরক্ষা, কৃষি-শিক্ষা ও শিল্পনীতি কিভাবে পরিচালিত হইত? এই সকল প্রশ্ন বাঙ্গালীর মনে উদয় হয়। কিন্তু ইহার সম্যক্ সমাধান করিতে কল্পনাও পরাজিত হয়। বিভিন্ন তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রশস্তিবচন হইতে বাংলার শাসন-ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের সামান্যমাত্র পরিচয় আজ পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। কোনও একজন বাঙ্গালী নরপতির শাসনতন্ত্র আলোচনা করা সম্ভব নহে। মুসলমান বিজয়ের পূর্বে হিন্দু ও বৌদ্ধবাংলার শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা মোটের উপর কি প্রকার ছিল তাহার অতিশয় অস্পষ্ট একটি চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হইতে পারে।

বাংলার নরপতিদর রাজ্য শাসন-সৌকর্য্যার্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল। এইগুলিকে ভুক্তি বলিত। ভুক্তিগুলি কতিপয় মণ্ডল এবং মণ্ডলগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভক্ত ছিল। গ্রাম ছিল নিম্নতম য়্যুনিট। দশখানা গ্রাম লইয়া দশ-গ্রাম গঠিত হইত। কয়েকটি দশগ্রাম লইয়া এক একটি বিষয় গঠিত হইত।

ভুক্তির শাসনকর্তাকে কি বলা হইত তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। মণ্ডলের শাসনকর্তাকে মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর বা মহামাণ্ডলিক বলা হইত: ইহাদিগকে উপরিকও বলা হইত। বিষয়ের কর্তৃস্থানীয় লোককে বিষয়পতি, দশগ্রামের প্রধানকে দশগ্রামিক এবং গ্রামের কর্তাকে গ্রামিক বলা হইত।

মণ্ডলেশ্বর বা উপরিক মণ্ডলের শান্তি-রক্ষার এবং সুবিচারের জন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহাদিগের বিচারালয়ের নাম ছিল অধিকরণ। উপরিকের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবার জন্য রাজধানীতে একজন বৃহদুপরিক নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা বিচারক ছিলেন তাঁহাদিগকে প্রাড়্-বিবাক বলিত। সর্বপ্রধান প্রাড়্-বিবাককে মহা-ধর্মাধ্যক্ষ বলা হইত।

ফৌজদারী বিচার-বিভাগ সাধারণ বিচার-বিভাগ হইতে পৃথক ছিল। ফৌজদারী বিভাগের বিচারপতি দণ্ডনায়ক নামে এবং প্রধান বিচারপতি মহাদণ্ডনায়ক নামে পরিচিত ছিল। দণ্ডপাশিক দণ্ড দেওয়ার যন্ত্রাদির তত্ত্বাবধান করিত এবং দণ্ডশক্তিক দণ্ড প্রদান করিত।

রাজপুরীর শান্তিরক্ষার ভার প্রতীহারদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। তাহাদিগের প্রধানদিগকে মহাপ্রতীহার বলিত। নগরের সাধারণ শান্তিরক্ষার ভার আশুপালের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কোট্টপাল দুর্গের শান্তিরক্ষা করিত। চৌরোদ্ধরণিক নামে এক জাতীয় কর্মচারী ছিল। তাহারা দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে জনসাধারণের দ্রব্যাদি উদ্ধার করিত। এক জাতীয় সৈন্যের সাহায্যেই প্রধানতঃ সমগ্র রাজ্যের শান্তি-রক্ষা করা হইত। বিভিন্ন স্থানে এক এক জন অধিনায়কের অধীনে এক একটি সৈন্যদল সংস্থাপিত হইত। এই দলকে গুল্ম

বলিত কয়েকটি গুল্মের সমষ্টিকে গণ বলিত। এই গণের সর্বাধ্যক্ষকে মহাগণস্থ বলা হইত। সমগ্র দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ইহাদের উপরই নির্ভর করিত। মহাগণস্থগণ বোধহয় উপরিকদের অধীনেই কার্য্য করিত।

রাজস্ব ভূমি ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারীদের উল্লেখ লেখমালাতে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শ্রমজীবী ও কৃষকদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্যও একটি বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক বিষয়ের হিসাব রাখিবার জন্য একটি কার্য্যালয় ছিল। এই কার্য্যালয়ে জমা ও জমির পরিমাণের হিসাব রক্ষিত হইত। বিষয়পতিগণই তাহাদের অধীনস্থ বিষয়ের রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়ী ছিল। বিষয়-কার্য্যালয়ের সর্বপ্রধান হিসাব-রক্ষকের নাম ছিল জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ। তাহার অধীনে বিভিন্ন স্তরের ছোট-বড় অনেক হিসাব ও দলিল রক্ষকাদির উল্লেখ দেখা যায়। রাজ্যব্যাপী স্বর্ণ আদান-প্রদান পর্য্যবেক্ষণের জন্য ভৌরিক নামক কর্মচারী নিযুক্ত থাকিত। রাজ-কর্মচারীদিগকে বেতন দিবার জন্য ভিন্ন একটি বিভাগ বর্তমান ছিল। এই বিভাগের কর্তাকে ভোগপতি বলিত। বাংলাদেশ নৌ-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। আমদানী ও রপ্তানীর যোগ্য দ্রব্যাদির উপর শুল্ক আদায়ের জন্য শৌল্কিক নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক গ্রামের জমি ও জমার হিসাব রাখিবার জন্য একটি দপ্তরখানা ছিল। এই দপ্তরখানার কর্মচারীকে পুস্তপাল বলিত।

বাণিজ্যাদি-কার্য্য পরিদর্শনের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। ইহার পরিচালনার ভার ব্যাপারকারণ্ডয় ও ব্যাপারাণ্ডয় নামক কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত ছিল। খাদ্য-দ্রব্যাদির সরবরাহের জন্য একটি ভিন্ন বিভাগ ছিল। দৌসাধিক শ্রম-বিভাগের কর্তৃত্ব করিতেন। গ্রামস্থ কৃষি ও তাহার উন্নতির জন্য বিধি-ব্যবস্থা করিবার ভার

ক্ষেত্রপগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। গো-মহিষ-ছাগ প্রভৃতি তত্ত্বাবধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ছিল।

রাজা যদি কাহাকেও ভূমিদান করিতেন তবে প্রজাপুঞ্জের অনুমতি গ্রহণ করিয়াই করিতেন। কোনও গ্রামের ভূমি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের নিয়ামক গ্রামের লোকরাই ছিল বলিয়া মনে হয়। ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর অনেকদিন পর্যন্ত যাহাকে তাহাকে জমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না। কাহাকে বিক্রয় করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বোধহয় গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। ফরিদপুরের তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা গিয়াছে যে, কোনও কোনও স্থানে ভূমির স্বত্ব-স্বামিত্ব কোনও ব্যক্তি-বিশেষের ছিল না। উহা গ্রামের প্রকৃতিপুঞ্জের এজমালী সম্পত্তি ছিল।

সৈন্য বিভাগের সর্বাধিনায়ক ছিলেন মহাসেনাপতি বা মহা-বলাধ্যক্ষ। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করিবার ভার ব্যূহপতিদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ব্যূহপতিদের প্রধানকে মহাব্যূহপতি বলা হইত। বাঙ্গালী সম্রাট্ ও রাজগণের শক্তিশালী নৌবাহিনী থাকিত। নাবাধ্যক্ষের হস্তে নৌবিভাগের অধ্যক্ষতা ন্যস্ত থাকিত।